নরেশ গুহের অপ্রকাশিত গল্প এবং ট্যান্টালাসের কাপ

প্রতিভা সরকার

‘এখন কি তবে জলে লিখে নাম চলে যেতে হবে? / কী তবে পেলাম, কী তবে হলাম!’

জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো সাহিত্যজগতেও চাওয়া পাওয়ার হিসেব বেশির ভাগই ভুলে ভরা। তাই কবি নরেশ গুহ, প্রাবন্ধিক নরেশ গুহ, অনুবাদক নরেশ গুহের ছায়া কিছু একনিষ্ঠ সম্পাদক এবং লিটল ম্যাগাজিনের হাল-না-ছাড়া অক্ষরকর্মীদের নাছোড় জেদের কারণে একশো বছরের বিস্মৃতির অন্ধকার সরিয়ে মাঝে মাঝে গা ঝাড়া দিলেও, গল্পকার নরেশ একেবারেই গোরের মাটিতে মিশে যাচ্ছেন, এ কথা বললে অত্যুক্তি হয় না।

নরেশ গুহ গল্প লিখতেন এ কথা শুনে অনেক সাহিত্যের ছাত্র চোখ কপালে তুলে ফেলে, জিজ্ঞাসা করে বসে, ‘দুরন্ত দুপুর’-এর কবি নরেশ গুহের কথা বলছেন? তাঁর প্রবন্ধ পড়েছি। গদ্যরচনাও। চিঠিপত্রের সংকলন তো অতি বিখ্যাত। কিন্তু তিনি আবার গল্পও লিখতেন নাকি! ভুলে যাওয়া তথ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় মাথা চুলকে এ কথাও বলতে পারে, ও হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ভবন থেকে তাঁর একটি ক্ষীণাঙ্গী গল্পপুস্তিকা বেরিয়েছিল, যার নাম ছিল ‘তপতীর মন’। কিন্তু তারপরেও সাহিত্যের এই ধারায় তাঁর আর কোনও অবদান আছে বলে তো জানি না।

কিন্তু বাস্তব এটাই যে নরেশ গুহ ‘তপতীর মন’-এর পর বহুধা মানবমনকে বিষয়বস্তু করে বেশ কয়েকটি গল্প লিখেছেন, এবং যে সব্যসাচী দক্ষতায় কবিতা, প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি, তাঁর গল্পেও রয়েছে সেই একই দক্ষতার নির্ভুল স্বাক্ষর। আর সেই সঙ্গে গল্পগুলি যদি হয় অপ্রকাশিত, তাঁর মৃত্যুর পর তোরঙ্গের কোণে বিবর্ণ একতাড়া হলদে কাগজের তাড়ার ভেতর আত্মগোপনকারী, তাহলে কি আমরা সেগুলো পড়বার জন্য আগ্রহী হব না?

আমার থেকে আমাকে আর বেশি কে জানে, তাই সবিনয়ে জানাই এতক্ষণ যে সাহিত্যের ছাত্রটির সঙ্গে সম্ভাব্য কথোপকথন লিপিবদ্ধ করলাম, সেটি স্বয়ং আমি, আর বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালার মতো আমার অজ্ঞ হাতে এখন জ্বলজ্বল করছে একটি পত্রিকা, ‘‘নরেশ গুহ ৯০’’, সম্পাদক শ্রী শুভাশিস চক্রবর্তী (অহর্নিশ, প্রথম প্রকাশ মে, ২০১৩)। এতে রয়েছে সাতটি অপ্রকাশিত ছোট গল্প যেগুলো আমাকে নতুন ভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে নরেশ গুহ নামে বাংলা সাহিত্যের এক অতি উল্লেখযোগ্য গল্পকারের সঙ্গে। জীবনানন্দের মৃত্যুর পর তোরঙ্গের গভীর থেকে তাঁর অজস্র লেখা উদ্ধারের মতো এ-ও এক উজ্জ্বল উদ্ধার।

এই যে দুই চরম সৃজনশীল মানুষ মৃত্যুর আগে অবধি যক্ষের মতো আগলে রইলেন নিজের সৃষ্টিকে, এর কারণ কী হতে পারে! আত্মবিশ্বাসের অভাব, সাহিত্যের অন্য ধারাগুলোতে বেশি লগ্ন থাকাজনিত ব্যস্ততা, নাকি নিজেকে চিনতে ভুল করা? ব্যাপক সাদৃশ্যের কারণে অন্য কেউ বিব্রত বা অসন্তুষ্ট হবে, এই বিবেচনাও থাকতে পারে। সাক্ষ্য দেবার জন্য সশরীরে কেউ উপস্থিত না থাকায়, এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা সক্রিয় হয় তাঁদের রেখে যাওয়া সৃষ্টিতে। কখনও কখনও সে তালাশ এতই ফলবতী হয় যে, খুব ঘনিষ্ঠ জনও অপ্রকাশিতকে হাটের মধ্যে প্রকাশ করতে বিড়ম্বনা বোধ করেন। হয়ত মনে হয় কল্পনায় কিছুমাত্র বাস্তবও যদি ছায়া ফেলে, তার অপব্যাখ্যা হবে। যেমন হয়েছিল মাল্যবান ও লাবণ্যের ক্ষেত্রে। কবি জীবনানন্দ সাত রাজার ধন এক মানিক, কিন্তু সংসারী নন। শুধু তাই নয়, তিনি প্রেমে একনিষ্ঠ নন, বেহিসেবী, আত্মভোলা, স্বভাবে কোথাও যেন কিঞ্চিৎ নিষ্ঠুর, আত্মমগ্ন, স্বার্থপর। উল্টোদিকে লাবণ্য নেহাতই সাধারণ মহিলা, যিনি হয়ত নিবিড় একটি সংসারের মধ্যমণি হবার জন্য লালায়িত ছিলেন। উৎপলার সঙ্গে মিল খুঁজতে গিয়ে সমালোচকেরা এই সহজ সত্যটিকে পাত্তা দিতে চান না দেখেছি। অথচ মাল্যবান বা অন্যান্য লেখাকে প্রকাশ করতে দেওয়ার ক্ষেত্রে লাবণ্যের এই দ্বিধা খুবই স্বাভাবিক।

তবে একথা তো নিশ্চিত যে মাল্যবানের অনেকটাই জীবনানন্দ স্বয়ং। জীবনানন্দের অবচেতন। নরেশ গুহের ক্ষেত্রেও কি তাই ঘটেছে? তাঁর ছোট গল্পগুলিতে টুকরো টাকরা ছড়িয়ে আছেন কি তিনি নিজেই? নিজের সৃষ্টির মধ্যে ছড়িয়ে থাকা তো সব কথাকারের ক্ষেত্রেই সত্য। তাহলে তার থেকে আরও কিছু বেশি? লেখক-মননের যে ছায়াময় দিকগুলো কখনও স্পষ্ট হয়ে সামনে আসেনি বা আনতে দেওয়া হয়নি, তাই কি আবছা ধরা দেয় পাঠকের চোখের আয়নায়?

তবে এ তুলনা বিভ্রান্তিকর, কারণ দু'জনেই কবি, কিন্তু দু'জন দুরকমের কবি। ব্যক্তিমানুষের বৈসাদৃশ্যও পাহাড়প্রমাণ। তাঁদের নিজেদের চরিত্রের কিছু ঝাপসা অস্পষ্টতা যেন স্পষ্ট হয়েছে তাঁদেরই সৃষ্ট চরিত্রে, এইটুকুই এ তুলনার সারবত্তা। নরেশ গুহের লেখা ও ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন সাধারণত এইরকম — ''স্নিগ্ধ'', ''স্বপ্নিল'', ''বিষণ্ণ-মধুর''। ''নিচু গলায় নরম করে বলার দিকে উন্মুখতা'', বুদ্ধদেব বসুর মতে, নরেশ গুহের স্বধর্ম।[১] যদি তাই হয়, তাহলে বলতেই হবে, এই অপ্রকাশিত গল্পগুলোতে নরেশ গুহ অনেক সোচ্চার, কোদালকে অক্লেশে কোদাল বলেন তিনি, নিজের ''লিরিকের দিকে ঝোঁক''-কে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করেই। সে প্রসঙ্গে যাবার আগে, এই গল্পগুলোর আবিষ্কারের ওপর যা অল্প-বিস্তর জানা গেছে, সেই তথ্য।

বহু বিদেশি গল্পের অনুবাদ-খ্যাত লেখক নরেশ গুহ কবিতা ভবন থেকে প্রকাশিত ''তপতীর মন'' ছাড়াও কিছু মৌলিক গল্প লিখেছিলেন। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণের পর কবিপত্নী শ্রীমতী অর্চনা গুহ একটি ফাইলে নরেশ গুহের লেখা আটটি ছোট গল্পের খসড়া আবিষ্কার করেন। অহর্নিশের সম্পাদক শুভাশিস চক্রবর্তী লিখেছেন,

> ''হলদে হয়ে যাওয়া ভঙ্গুর সেই পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার করে দেখা গেল যে সেই আটটির মধ্যে একটি গল্প অসম্পূর্ণ এবং 'চীন ভারত উপকথা' শীর্ষক গল্পটি অনুবাদ। বাকি পাঁচটি গল্পের মধ্যে দুটি খসড়া আকারে লেখার পরে আবার নতুন করে লেখা হয়েছে। বাকি চারটি খসড়া আকারেই আছে, তবে কোথাও কোথাও সংশোধন করা হয়েছে। শেষপর্যন্ত আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম 'নরেশ গুহ ৯০' উপলক্ষ্যে আমরা এই সাতটি অপ্রকাশিত গল্প বর্তমান সংকলনে প্রকাশ করব। আমরা জানি, প্রায় ৫০/৬০ বছর আগে লেখা এই গল্পগুলি লেখকের বিচারে প্রকাশযোগ্য হয়ে ওঠেনি বলেই তারা কোনদিন মুদ্রণ সৌভাগ্য লাভ করেনি। কিন্তু, গল্পগুলি

> পাঠ করে আমাদের মনে হয়েছে, এইগুলি প্রকাশ করলে তা 'দুরন্ত দুপুর'-এর কবির প্রতি কোনো অবিচার হবে না, বরং পাঠকের কাছে গল্পলেখক নরেশ গুহের পরিচয়টি জোরের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা পাবে।"[২]

প্রথম গল্প ''দেওয়াল"। পরিবার পরিজন, বন্ধুদের পৃথক করে দেওয়া এক মানসিক দেওয়ালের এপারে নিঃসঙ্গ লেখক-নায়ক, যে সকলের উপহাসের বস্তু — ''কী অপরাধ করেছি আমি? কী অন্যায়, যার এই অনুচ্চারিত শাস্তি? যতোবার নিজেকে সে এই প্রশ্ন করল ততবার যেন চারদিক থেকে হাসির হায়েনারা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার গায়ে, খণ্ড খণ্ড করে ছিঁড়তে লাগলো তাকে!"[৩]

পরিবারের দৈনন্দিন জীবন থেকে খসে পড়া এই আলাভোলা লেখক-টেখক যুবকের প্রতিদ্বন্দ্বী তারই নিজের ভাই সোমেশ। রীতিমতো শরীরচর্চা করে সে, শিবপুরে ভর্তি হবার ব্যবস্থা পাকা। সংসারের একমেবাদ্বিতীয়ম ''পিতা"-র বশ্য সে। ''বাবার কথাই জীবনে তার শেষ কথা। নিজেকে নিয়ে তার মনে কোনো সমস্যা নেই, প্রশ্ন নেই। তার পরিবেশকে সে মেনে নিয়েছে, মেনে নিয়ে সুখী হয়েছে জীবনে। তাতে সে যে ভুল করেনি তার প্রমাণ তো হাতে হাতেই দেখা গেল। না হলে শিবপুরের সরকারী কলেজের ধাপে, সাংসারিক স্বর্গে চড়ার সিঁড়িতে এমন একলাফে সহজে চড়ার সুযোগ সে কোনোদিন পাবে বলে কি ভেবেছিল?"[৪]

সোমেশ রূপবান,গুণবান, শক্তিমানও বটে। তবুও এ গল্প যাকে ঘিরে আবর্তিত, সে একা হয়ে যাওয়া কবিস্বভাব অরিন্দম, যে নিজের ঘরের নিরালায় উপন্যাস লেখে গোপনে, কারণ ''বাবা"-কে সে সে যমের মতো ভয় করে। মুখচোরা ছেলেটি এমনই মন্দভাগ্য, দাঙ্গার ভয়াবহতায় তার ডান হাতটি মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত হয় আর সে চিরজীবনের মতো পঙ্গু হয়ে যায়।

কিন্তু অরিন্দমের সংগ্রাম থেমে থাকে না। বাঁ হাতে উপন্যাসটি শেষ করবার প্রাণপণ চেষ্টার মাঝে সে জানতে পারে, বাবা তার জন্য একটি ওষুধের দোকানের কাজ ঠিক করে ফেলেছেন। সেখানে বাঁ হাতের সই-ই যথেষ্ট। তার পরের অংশটুকু রচনার সৌষ্ঠবে, ''উঁচু কথা নিচু আর নরম" করে বলবার গুণে খুবই আগ্রহোদ্দীপক। সেটুকু উদ্ধৃত করছি,

> ''...এমন সময় অনেক কাল পরে পরমেশবাবু দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন। স্নেহে করুণায় তাঁর সৌম্য মুখখানি স্নিগ্ধ। ডানহাতের ওপর হাতখানি রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখনও কি যন্ত্রণা হয়?'
>
> অরিন্দম ঘাড় নাড়ল। কী আশ্চর্য! অরিন্দমের মনে হল, তার ঐ ডান হাতখানা যেন সকলের শত্রু। তার হৃতশক্তি হাতখানার দিকে পরমেশবাবু নিষ্ঠুরের মতো তাকিয়ে আছেন।
>
> — 'একি বাঁ হাতে লিখছ নাকি! এখনই এত তাড়া কিসের? ভালো হয়ে ওঠো, নামটা সই করতে পারলেই চলে যাবে।'
>
> তিনি জানতেন অরিন্দম এ ইঙ্গিত বুঝতে ভুল করবে না।
>
> — শুধু নাম কেন, আমি বেশ লিখতেই শিখেছি।' বলে অরিন্দম এমন করে হাসলে যে পরমেশবাবুর চোখ থেকে সেই স্নিগ্ধ হাসি মিলিয়ে গেল দেখতে দেখতে। অরিন্দমের মনে হল সেই অদৃশ্য দেওয়ালটা আবার তাদের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে।"[৫]

সশব্দে দেওয়াল গড়া বা ভাঙার মোটা দাগের গল্প এ নয়, বরং নীরব প্রতিরোধ, শীতল প্রতিজ্ঞা, মানসিক টক্কর, একে শাণিত করেছে।

কর্তৃত্বের প্রতীক এই ''পিতা" বা অমিত শক্তিধর এক ফাদার-ফিগার বার বার ফিরে এসেছে নরেশ

গুহের গল্পগুলোতে নিয়ন্ত্রণের বিপুল ইচ্ছা নিয়ে। সবসময় সে পিতা এমন নয়, কখনও সে শুভানুধ্যায়ী, কখনও প্রেমিক, কখনও বা সহোদর। কিন্তু প্রত্যেক পদে অনুভব করা যায় তার উপস্থিতি, উপদেশ, শুভাকাঙ্ক্ষা। এই অপ্রকাশিত গল্পগুলোর কোনও কোনোটিতে এই সর্বগ্রাসী পিতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তীব্র, এমন কী দৈবী সুযোগের আশ্রয় নিয়েও গল্পকার একে হারিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি।

যেমন ''মৃত্যুর চেয়ে বড়'' গল্পটি। অশোকের ছোট বোন মলু, এক আশ্চর্য সুন্দর অথচ সাধারণ মেয়ে, যার দিকে তাকালেই বোঝা যায় 'ও যেন বিয়ের জন্যই বড় হয়ে উঠেছে।'[৬] তাদের ''অভিভাবক'' মামাবাবু, উঠতি-যৌবনা মলুকে পার করবার জন্য বেজায় উদগ্রীব, ''মলু এখন বেশ বড় হয়ে উঠেছে। ওকে আর রাখা চলে না।''[৭]

কিন্তু মলুর বিয়ে ঠিক করেও ভেঙে দিতে বাধ্য হয়েছিল অশোক, কারণ এক দুপুরে ''প্রচণ্ড দাবী''র মতো মলুকে চেয়ে বসল তার খামখেয়ালি বন্ধু অরুণ, ''মুখে তার একধরনের দৃঢ়তা যা প্রতিপক্ষের মনে ভয় ধরিয়ে দেয়।''[৮] দু' বছর সময় চেয়েছিল সে, সরল মলুও নত হয়েছিল, কিন্তু সময় পেরিয়ে গেলেও অরুণের কথা রাখার কোনও তোড়জোড় দেখা গেল না। মলু এবং অশোকের জীবনের মোড় ঘোরানো সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্যক্তিত্ব এখন অন্য পথের পথিক। আর্টিস্ট হবার জন্য ব্যাকুল অরুণ এখন আপিসের অ্যাপ্রেন্টিস। মলু নয়, এখন তার জীবনে অন্য নারীর উপস্থিতি।

নরেশ গুহের লিখনসৌষ্ঠবের সন্ধান এই গল্পটির সর্বত্র সহজলভ্য। বাস্তবের মুখোমুখি অশোকের মনের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখলেন,

> ''অনেকবার মনে হল সেই উঁচু নদীর পাড় থেকে একটা ভাঙা মাটির চাপের সঙ্গে হুড়মুড় করে সেও পড়ে যায় — ডুবে যায় — মিলিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিন্তু ভোর রাতে সার্চলাইটের আলো ফেলে ফেলে ইস্টিমারটা আবার ফিরে এল। ফিরে এল অশোক। কিন্তু বাড়িতে এল না। চঞ্চল মনে এদিকে সেদিকে ভেসে বেড়াল কিছুদিন।
>
> প্রায় একমাস পরে বাড়ি ফিরে মলুকে আবিষ্কার করা গেল। তখন অনেক রাত হয়েছে। রেলিং ধরে চুপ করে ও দাঁড়িয়ে ছিল। যা সাধারণত ও থাকে না। নীচেই তিস্তার একটা খালে জলের শব্দ। প্রথম শীত পড়েছে একটু একটু। আকাশ ভরা তারা যেন এক ঝাঁক রূপালি মৌমাছির মতো পৃথিবীর দিকে নেমে আসছে। অনেকক্ষণ দুজনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল পাশাপাশি। একটা কথাও নেই যেন বলার। অনেকক্ষণ পরে স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো মৃদু গলায় বলল অশোক — 'মলু বোন হলেও তুই আমার বন্ধুর মতো। প্রায় সমবয়সী আমরা। নিষ্ঠুর হলেও একটা কথা তোকে আজ বলব।'
>
> — ' অরুণ বিয়ে করেছে, এই তো। শুনেছি।—'
>
> অশোক স্তব্ধ হয়ে গেল। এ যেন সে মলুই নয়। এ গলা তার নয়, এ বলার ভঙ্গী তার নয়। কী বিষণ্ণ গম্ভীর শোনাল তার কথাগুলো, এমন আর কোনোদিন সে শোনেনি। আর ঐ যে নামটা উচ্চারণ করল — অরুণদা নয়, শুধু অরুণ ওর মধ্যে এমন কি ছিল যা শুনেই, তার লজ্জায় মাথা নত হল। সে যে পুরুষ এই তার লজ্জা।''[৯]

লেখক এখানেই গল্পটি শেষ করতে পারতেন। করলে কোনও ক্ষতি হত না। কিন্তু কী এক তাড়নায় তিনি এটিকে নিয়ে গেলেন প্রায় অসম্ভব এক সমাপ্তির দিকে। পথের মধ্যে এক অ্যাক্সিডেন্টে মারাত্মক আহত অশোককে উদ্ধার করে প্রয়াত অরুণের অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে কমলা আর বিনু। তারা পিতৃ-মাতৃহীন, মলুও ততদিনে মৃত। অশোক তাদের চিনতে পারে, পরিচয় প্রকাশ না করেই মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে। কিন্তু শেষ নিঃশ্বাস ফেলবার আগে জীবনের বহমানতাকে অনুভব ক'রে ছেলেমেয়ে দুটির

মঙ্গল কামনা করে। আলফা মেল অরুণের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা এইভাবে প্রজন্মান্তরে এল, ভাগ্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে। মানবতার জয় হল। বাস্তবতার হল কি?

''অসম্ভব'' গল্পটিতেও সুপ্রতিম এইরকম একটি চরিত্র, যে কিনা অল্প আলাপের বাধা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে সমবয়সী একটি মেয়ের কাছ থেকে সৌজন্য-লিখন আশা করে। ''লোকের শ্রদ্ধা পেয়ে, সমীহ কুড়িয়ে তার এমনই একটা স্বভাব হয়ে গিয়েছিল যে এটাকে তার একটা অনায়াস প্রাপ্য বলেই মনে হতো।''[১০] সুপ্রতিমের সর্বগ্রাসী প্রভাব কাটাবার অনেক চেষ্টা করে অপর্ণা। কিন্তু শেষকালে পেরে উঠবে কিনা সেই ভবিতব্যের সামনে দাঁড়িয়ে পাঠককে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকতে হয়।

অপ্রকাশিত গল্পগুলির মধ্যে গুণমানে শ্রেষ্ঠ বোধহয় ''সাপ'' গল্পটি। সম্পর্কের ভাঙাগড়ার কুয়াশা এখানে এত গাঢ়, এত ক্রুর; দুটি নরনারী কে কার ওপর অধিকার হারাচ্ছে তা পরিষ্কার করে না বলে পাঠকের ওপর সিদ্ধান্ত ছেড়ে দেওয়া; মনে হয়, নরেশ গুহ এই একটি গল্পের জন্যই বাংলা ছোটগল্পের জগতে স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারতেন। একটা অদ্ভুত রহস্যময়তা নরনারীর সম্পর্কের টানাপোড়েনের সঙ্গে কুয়াশার মতো মিশে আছে। যা বুঝছি তা সত্য কিনা, যা ভাবছি তা কি মিথ্যা, গল্প শেষ হয়ে যায়, কিন্তু এই দ্বন্দ্বের শেষ হয় না।

রাত একটার সময় সিঁড়িতে কারও পায়ের শব্দ। যে এই অসময়ে ফিরছে আর ঘরের ভেতর যে প্রতীক্ষায় জেগে আছে, দুজনেরই মানসিক যন্ত্রণা অত্যন্ত তীব্র। এরা দুজন কিন্তু স্বামী স্ত্রী এবং যে এই মাঝরাতে ফিরছে সে বকুল, শশাঙ্কের স্ত্রী। কী করে তাদের মধ্যেকার দেওয়াল এত পোক্ত, এত সুউচ্চ হল, দুজনের কেউই জানে না। তবু এই চূড়ান্ত বোঝাপড়ার দিনে দুটি প্রাণই ফেটে পড়ছে হাহাকারে, যেন সময়ের চাকা ঘুরিয়ে দেওয়া গেলে দুজনেই খুশি হত। কী নিয়ে তাদের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব, কেনই বা তাদের কাছে আসতে চেয়েও দূরে সরে যাওয়া, সে সম্বন্ধে গল্পকার একটি কথাও উচ্চারণ করেননি। শুধু তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার বর্ণনাই এত শক্তিশালী, যে পাঠকের মনোযোগ এক মুহূর্তের জন্যও বিচ্যুত হয় না।

এ কথা তো ঠিক, নরেশ গুহের পর বাংলা গল্প অনেক এগিয়ে গেছে, ক্রমাগত শক্তিশালী হয়েছে প্রথম থেকেই বেগবতী এই ধারাটি। কিন্তু ''সাপ'' গল্পটি বুঝিয়ে দেয় কেন তিনি প্রাসঙ্গিক, কেন তিনি শ্রেষ্ঠদের অন্যতম হবার দাবিদার।

নরেশ গুহের জীবন প্রথম দিকে অবশ্যই সংগ্রামের এবং অস্বাচ্ছন্দ্যের। তবু রোমাঞ্চপ্রিয়তা, আদর্শিক দৃঢ়তা তাঁকে কখনও ত্যাগ করেনি। অকৃতজ্ঞতার পাপ স্পর্শ করেনি তাঁকে। তারুণ্যের স্পর্ধায় শান্তিনিকেতন তীর্থে তীর্থযাত্রীর মতো পায়ে হেঁটে রবীন্দ্রনাথকে দেখতে গিয়েছিলেন তিনি, একথা আজ বহুশ্রুত। স্বাধীনতা লাভের পর পর দাঙ্গা-দুর্গতদের সেবাকর্মে স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীর সফরসঙ্গী হয়েছিলেন। কর্মচঞ্চল জীবনে সাংবাদিকতা, অধ্যাপনা ইত্যাদি করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর জীবনের প্রথমার্ধ কেটেছে চরম দারিদ্রের মধ্যে। ভাইবোনেদের যাবতীয় দায়িত্বের গুরুভার তিনি একাই বহন করেছেন। অথচ নিজেরই মাথা গোঁজার নির্দিষ্ট কোনও ঠাঁই ছিল না। কলকাতায় রিপন কলেজে ভর্তি হন, কিন্তু ঘুঘুডাঙায় যে আত্মীয়ের ভরসায় এসেছিলেন, তাঁরা নরেশকে বিতাড়নের জন্য উন্মুখ হয়ে ছিলেন। পায়ে হেঁটে কলেজে যাওয়া, সস্তার পাইস হোটেলে নিরামিষ খাওয়া, এইসবের মধ্যখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে আলাপ। প্রমথনাথ বিশীর কাছ থেকে ছাত্র হিসেবে প্রচুর স্নেহ পেয়েছেন। কিন্তু বুদ্ধদেব যে ভূমিকা

নিলেন, আজকের দিনে তাকে ''মেন্টর'' বললে অত্যুক্তি হবে না। শুধু ব্যবহারিক জীবন নয়, নরেশের সৃষ্টির ওপরেও কড়া নজর ছিল এই দেশ বিদেশে বন্দিত মানুষটির। খুব তাড়াতাড়ি তাঁরা অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন, যদিও সে অন্তরঙ্গতা ছিল গুরু-শিষ্যের, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর, দাতা-গ্রহীতার, অভিভাবক এবং স্নেহধন্যের। এই ঋণ নরেশ গুহ সজ্ঞানে মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হননি এবং কৃতজ্ঞতার পাহাড় সারা জীবন কাঁধে বয়েছেন।

বুদ্ধদেব বসু এবং নরেশ গুহের চিঠিপত্র 'কবিকে লেখা কবির চিঠি' পড়লে এ সম্পর্ক সম্বন্ধে সম্যক ধারণা হয়। প্রথম চিঠিতেই বুদ্ধদেব ভর্ৎসনা করেছেন, ''তোমার এ কবিতায় তুমি যে অসংবদ্ধতার পথ নিয়েছ, সে-পথ ভয়াবহ। আজকালকার অনেক বাঙালি কবির — ইংরেজ কবিরও — এ পথেই অপঘাত ঘটেছে এবং ঘটছে। মহাকবিদের দুর্বলতাগুলোরই অনুকরণ সহজ; যেমন এককালে রবীন্দ্র প্রভাবে মিঠে মিঠে পদ্যে বাংলাদেশ ছেয়ে গিয়েছিলো, তেমনি এখন পাউণ্ড এলিয়টের দৃষ্টান্তে অসংলগ্ন অর্ধোচ্চারণে সমস্ত ইংরেজি-জানা পৃথিবী ছেয়ে যাচ্ছে।...

আমি অন্তত তোমাকে নিজের বাগানেই চাষ করতে বলব। হোক ছোট, হোক স্বল্প, তবু তো বাগান, কাঁটাবন নয়। তোমার স্বকীয় যে বিষণ্ণ মধুর সুর সেটাকে 'Surface sweetness' বলে অবজ্ঞা কেন করবে?''[১১]

কবি নরেশ গুহের বিচরণক্ষেত্র এইভাবে চিহ্নিত হল, কোথায় তাঁর স্বরাট সাম্রাজ্য সে মাপজোক মিটল। এরপর যখন পূর্বাশা প্রেসের সঙ্গে নরেশ গুহের সংঘাত, তখন কিন্তু আর বুদ্ধদেব এতটা স্বতঃস্ফূর্ত নন। প্রাণখোলা উপদেশ নয়, সাবধানী প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট তাঁর চিঠিতে। ''পূর্বাশা প্রেসের কর্তৃপক্ষ তোমার সঙ্গে যে-রকম ব্যবহার করেছেন, তার খবর পেয়ে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছি! সঞ্জয়বাবু যাতে তোমাকে প্রীতির চোখে দ্যাখেন আমি তার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করেছিলাম — খুব সফল হয়েছি বলে মনে হয়নি, কিন্তু তাই বলে তোমাকে অপমানিত হতে হবে তাও আমার ধারণা ছিল না।...আরো দুঃখ পাচ্ছি এই ভেবে যে এই সূত্রে সঞ্জয়বাবুদের সঙ্গে আবার না আমার বিচ্ছেদের সূত্রপাত হয়।''[১২]

বুদ্ধদেবের আমেরিকা-প্রবাসের সময় কবিতা ভবনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নরেশ গুহের কাঁধে। নিজেই লিখেছেন, ''তোমাকে লিখতে গেলে সবই প্রায় 'কাজের চিঠি' হয়ে দাঁড়ায়।'' কবিতা পত্রিকায় ছাপা নরেশ গুহের কবিতা সম্বন্ধে তাঁকেই লিখছেন, ''তোমার কবিতাটি সুন্দর, কিন্তু বড্ড অমিয়বাবু ধরন হয়ে গেছে — এবার একটু গম্ভীর বড় মাত্রার ছন্দ যদি ব্যবহার করো তাহলে তোমার স্বকীয়তার আরো সমৃদ্ধি হবে বলে মনে হয়।''[১৩]

এই খোলামেলা মত বিনিময়ে নরেশ গুহ নিশ্চয়ই লাভবান হয়েছেন। কৃতজ্ঞতা যেহেতু তাঁর চরিত্রের এক মহৎ ভূষণ, গ্রীসে তিনি সস্তা ভুট্টা ও জল খেয়ে কাটিয়েছেন, তবু বুদ্ধদেবের জন্য উপহার কেনার জমানো টাকা খরচ করেননি। বুদ্ধদেবকে যাদবপুরের পদ ছাড়তে হয়েছে বলে, নিজে সেই চেয়ারে বসতে অস্বীকার করেছেন। উল্টোদিকের কাহিনি অবশ্য এমন একরোখা নয়। একবার কোনও রটনায় অসন্তুষ্ট বুদ্ধদেব নরেশ গুহের সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিলেন। বিমান বন্দরে রিসিভ করতে যাওয়া সস্ত্রীক নরেশের বিব্রত অবস্থা বুঝেছিলেন প্রতিভা বসু। নিজের মেয়েদের জন্য আনা বিদেশি পুতুল তিনি কন্যার জন্য নরেশ-জায়ার হাতে তুলে দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে চাইলেন।

তাঁর কবিতার সংজ্ঞা যেমনই দেওয়া হোক, নরেশ গুহ মানুষটিকে কৃতজ্ঞতা-পাশে যতই নিরীহ দেখাক, মেরুদণ্ড কিন্তু তাঁর সোজাই ছিল। অনেক ঘটনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর সম্পাদনায় সাগ্নিক নামে একটি পত্রিকার আত্মপ্রকাশ করবার কথা ছিল। ''কিন্তু পরিচালকবর্গ অচিরাৎ বুঝতে

পারলেন সম্পাদনার কর্মে আমি যে-পরিমাণ ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার দাবি করেছিলাম তাতে রাজি হওয়া সম্ভবপর ছিল না তাঁদের পক্ষে।"[১৪]

যুগান্তরে সহকর্মী রবি ঘোষ, কট্টর কমিউনিস্ট, নরেশ গুহের অবস্থা দেখে তাঁর দু বোন সহ নিজের একটি ঘরে বিনা ভাড়ায় থাকতে দেন। কিন্তু ধর্মঘটীদের নেতা হবার জন্য যুগান্তর কর্তৃপক্ষ রবি ঘোষকে বরখাস্ত করে। নরেশ পড়লেন মহা মুস্কিলে। রবিকে যারা বরখাস্ত করেছে, তাদের চাকরি করবেন রবির দাক্ষিণ্য নিয়ে, এটা তাঁর কাছে খুব অনৈতিক ঠেকে এবং দু বোনকে নিয়ে তিনি অন্যত্র চলে যান। সেখানে এত ছোট ঘর যে তিনি ফোল্ডিং খাটিয়া কিনে উঠোনে রাত্রিবাস শুরু করলেন।

তাঁর করা শিরোনাম না জানিয়ে বদলে দেবার জন্য নরেশ গুহ যুগান্তরের চাকরি ছেড়েছিলেন। কবিতা পত্রিকার জীবনানন্দ স্মৃতি সংখ্যায় সহকারী সম্পাদক হিসেবে প্রথমে তাঁর নাম মুদ্রিত হয়েছিল। পরে তাঁর নিজের আপত্তিতেই তাঁর নাম বাদ যায়, থাকে শুধু সম্পাদক বুদ্ধদেব বসুর নাম। এত গুরুত্বপূর্ণ একটি সংখ্যা থেকে নাম প্রত্যাহার কোন কারণে, জানা যায় না।

কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা, গুণগ্রাহিতা কি কখনও কখনও গ্রহীতার সঙ্গে ট্যান্টালাসের পানপাত্রের সাদৃশ্যের জন্ম দেয়? বিপুল চাহিদা মেটাতে মেটাতে দাতা ক্লান্ত হয়ে পড়তে পারে, কিন্তু বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ, ভাল-না-লাগা প্রকাশ করবার উপায় নেই। এইরকম আপাত অসহায় অবস্থা কি লাভা উদগীরণ করে না আমাদের অবচেতনে? নরেশ গুহের অপ্রকাশিত গল্পগুলো কি তবে সেই লাভা চিহ্নিত? কিন্তু এত অল্প এবং অনালোচিত সাক্ষ্য, তা যতই অবচেতন-ঘটিত হোক না কেন, এই রকম সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেওয়ার স্পর্ধা রাখে না, একথা বলাই বাহুল্য । তবে বলতেই পারি, নরেশ গুহের অপ্রকাশিত গল্পগুলোর পথ নিঃসন্দেহে কবিতা-ভবন প্রকাশিত 'তপতীর মন'-এর গল্পগুলোর থেকে আলাদা। সম্পর্কের জটিলতায়, প্রতিবাদের সাহসে, রচনার সৌকর্যে, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তারা যেন আরও অনেক কিছু বলতে চায় এবং সেই বক্তব্য মোটেই বিষণ্ণ মধুর নয়। বরং তিক্ত কষায়।

বাকি কথাটুকু থাকুক অতীত খননকারী ভবিষ্যতের কুশলী গবেষকের হাতে।

---

১ কবির কাছে কবির চিঠি, বুদ্ধদেব বসুর অপ্রকাশিত চিঠি নরেশ গুহকে, চিঠি সংখ্যা ১
২ নরেশ গুহ ৯০ সংখ্যা, অহর্নিশ, ২০১৩, ভূমিকা,শুভাশিস চক্রবর্তী
৩ 'দেওয়াল' নরেশ গুহ ৯০ পৃষ্ঠা ১১
৪ ঐ, পৃষ্ঠা ১৩
৫ ঐ, পৃষ্ঠা ২০
৬ মৃত্যুর চেয়ে বড়, নরেশ গুহ ৯০, অহর্নিশ, পৃষ্ঠা ৪৫
৭ ঐ পৃষ্ঠা ৪৮
৮ ঐ পৃষ্ঠা ৫২
৯ ঐ পৃষ্ঠা ৫৩
১০ অসম্ভব, নরেশ গুহ ৯০, অহর্নিশ পৃষ্ঠা ৩২
১১ কবির কাছে কবির চিঠি, বুদ্ধদেব বসুর অপ্রকাশিত চিঠি নরেশ গুহকে, চিঠি সংখ্যা ১
১২ ঐ, চিঠি সংখ্যা ২
১৩ ঐ, চিঠি সংখ্যা ৫
১৪ নরেশ গুহ : জীবনপঞ্জি ও গ্রন্থপঞ্জি, প্রভাত কুমার দাস, পৃষ্ঠা ৪০৫, অহর্নিশ, নরেশ গুহ সংখ্যা, ২০০৯

প্রতিভা সরকার : গল্পকার, ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক। জয়পুরিয়া কলেজের ইংরাজি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক।